বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

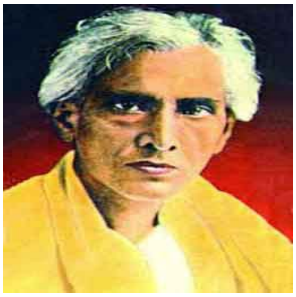

লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এফএ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের ইতি ঘটে। তিনি জীবনের প্রথমদিকে একটি জমিদারী এস্টেটে সামান্য চাকরি করেন। চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাসীর বেশে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু এ-বৈরাগ্যময় জীবনে তাঁর মন টেকেনি। ১৯০৩ সনে তিনি সমুদ্র পথে বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যান এবং রেঙ্গুনে রেল-অফিসে কেরানি পদে চাকুরি করেন। সেখানেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু। ১৯০৩ সালে প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৬ সনে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাঁর স্থান শীর্ষে। বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ বেদনার ভাষাকে তিনি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে অংকিত করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের কথাকে সাবলীল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপনার কৌশলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মানুষের মনুষ্যত্বকেই শরৎচন্দ্র বড় করে দেখেছেন। বেদনালাঞ্ছিত মানবতার রূপ অঙ্কনে তিনি ছিলেন অসাধারণ। সাধারণ বাঙালি জীবনের দৈনন্দিন হাসি-কান্নার উপাখ্যান প্রীতি ও করুণার রসে সিক্ত করে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

উপন্যাস : *বড়দিদি* (১৯১৩), *পরিণীতা* (১৯১৪), *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *দেবদাস* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *শ্রীকান্ত* (৪ পর্ব, ১৯১৭-১৯৩৩), *গৃহদাহ* (১৯২০), *দেনা পাওনা* (১৯২৩), *পথের দাবী* (১৯২৬), *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১);

গল্প গ্রন্থ : *রামের সুমতি* (১৯১৪), *মেজদিদি* (১৯১৫), *বিলাসী* (১৯১৮), *ছবি* (১৯২০),*হরিলক্ষ্মী* (১৯২৬)।

ভূমিকা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) বৈশাখ সংখ্যায়। এই গল্পে লেখক ন্যাড়া নামের যুবকের জবানিতে তাঁর নিজের প্রথম জীবনের ছায়াপাত ঘটিয়েছেন। এই গল্পে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠুর আচরণের ঊর্ধ্বে দুই মানব মানবীর প্রেমের মহিমা ফুটে উঠেছে। দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ সব কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসার আবেদন এই গল্পের মূল বিষয়।

সাধারণ উদ্দেশ্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্পটি পড়ার পর আপনি–

- জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- হিন্দুসমাজের বর্ণপ্রথার চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১

১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে পারবেন।
- পল্লিগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাথমিক পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- সেবাপরায়ণা বিলাসীর চরিত্রের বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রামের মানুষের সাধারণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই– দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লিগ্রামে, তাহাদের ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এ কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতের চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়– চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি– বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-স্বরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তারপরে এ কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান– তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে তো পল্লির দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, কিন্তু ঐ চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই– দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও তো দুই তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুরমেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা– কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী, এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে– এ সকল দরকারি তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না।

কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কী জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ। এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে– তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এই খবর আমরা কেহই জানিতাম না– সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়– আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা– সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কী! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়– উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেই দিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই– বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা তো দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে, এই কথাও কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না– গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালোপাড়ার এক বুড়া মালো তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এই যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি– মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের ওপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ঐ মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসী ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বসো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটি কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা। সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মতো বোধ হইতেছিল, পথ দেখা তো দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না তো? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না তো! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম, উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এ বনের পথ পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম না। এ দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় তো যে-কোন মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এ বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কী করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত।

এ প্রসঙ্গের অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি– বাটীতে ছেলেপুলে, চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা স্ত্রী আর আমি। তাঁর স্ত্রী তো শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এ রাত্রেই গ্রামের পাঁচজন যদি নদীর তীরের কোনো একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় তা পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? এমনি কত কী। কিন্তু আমার তো আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেয়া চাই– অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভাই, যা হবার সে তো হইয়াছে, আর বাইরে গিয়া কী হইবে? রাতটা কাটুক না।"

বলিলাম "অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।"

তিনি বলিলেন, "হোক কাজ, তুমি বসো।"

বলিলাম, "বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে", বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে বাপরে। আমি একলা থাকতে পারব না।"

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে তাঁর মৃতদেহটা এ অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এ কথা বলিতে চাই যে শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোনো সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সে শক্তির পরিচয় যখন কোনো নরনারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেয়ার আবশ্যক যদি হয় তো হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নহে, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনো মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লিগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে, অতবড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই। তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এ-ই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এ যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লিগ্রামে ছিল কিনা, কিন্তু একালে তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অভিপ্রায়– ইচ্ছা। **অচৈতন্য**– অজ্ঞান।**এডেন–** লোহিতসাগর ও আরব সাগরের প্রবেশপথে আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত। **এমনি সুনাম–** দুর্নাম বোঝাতে বিদ্রূপ করা হয়েছে। **ওপরের আদালতের হুকুমে–** স্রষ্টার নির্দেশে। **কানাচ–** ঘরের পেছন দিককার লাগানো জায়গা। **কামস্কাট্‌কা–** প্রকৃত উচ্চারণ কামচাট্‌ক (Kamchatka) রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ওখটক সাগর ও উত্তর-পূর্বে বেরিং সাগর। উপদ্বীপটি পার্বত্য তুন্দ্রা ও বনময়। বহু উষ্ণ প্রস্রবণ ও সতেরোটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে এখানে। প্রচুর স্যামন মাছ পাওয়া যায় বলে দ্বীপটি স্যামন মাছের দেশ নামে পরিচিত। রাজধানী শহরের নাম– পেত্রোপাভ্‌লোভস্ক্। **কৃতবিদ্য–** বিদ্যা অর্জন করেছেন এমন পণ্ডিত, বিদ্বান। **ক্রোশ**– এক ক্রোশ দুই মাইলের সমান। **খেজুরমেতি–** খেজুর গাছের মাথার কাছে নরম মিষ্টি অংশ বা রস। **গুলি–** আফিঙের তৈরি একরকম মাদক যা বড়ির মতো গুলি পাকিয়ে ব্যবহার করা হয়। **চল্লিশের কোঠা–** এখানে চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত বয়সসীমা। **জনশ্রুতি**– লোকে বলে এমন। **জ্যান্ত**– জীবন্ত। **তক্তপোষ**– খাট। **তোগলক খাঁ–** ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোগলক খাঁ নামে কোনো সম্রাট ছিলেন না। ইতিহাসে যে তিনজন বিখ্যাত তোগলক সম্রাটের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন : গিয়াসউদ্দিন তোগলক, মুহাম্মদ তোগলক ও ফিরোজ তোগলক। **থার্ড ক্লাস–** বর্তমান অষ্টম শ্রেণি। সেকালে মাধ্যমিক শিক্ষার শ্রেণি হিসাব করা হতো ওপর থেকে নিচের দিকে। দশম শ্রেণি তখন ছিল ফার্স্ট ক্লাস। **দণ্ড–** শাস্তি। **পারশিয়া–** পারস্য বা ইরান দেশ। **প্রকৃতিস্থ–** স্বাভাবিক অবস্থা। **প্রদীপ–** বাতি, আলো। **প্রত্নতাত্ত্বিক–** পুরাতত্ত্ববিদ। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি। **ফোর্থ ক্লাস–** এখনকার সপ্তম শ্রেণি। **বঁইচি–** কাঁটাযুক্ত একরকম ছোট গাছ ও তার ফল। **বাটীতে**– বাড়িতে। **মালো–** সাপের ওঝা, অনগ্রসর শ্রেণিবিশেষ। এরা সাপ ধরতে, সাপের কামড়ের চিকিৎসায় ও সাপের খেলা দেখাতে পটু। এসব করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। **মা-সরস্বতী–** হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণি। **যমরাজ**– মৃত্যু দেবতা।**রম্ভার কাঁদি–** কলার ছড়া। **শিয়রে**– মাথার নিকটে।**সহমরণে**– একত্রে বা এক সংগে মরণ। **সাইবেরিয়া–** এশিয়ার উত্তরাঞ্চলেরাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এশিয়া মহাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। তুন্দ্রা, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, স্তেপ তৃণভূমি ও পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান চালু হওয়ার পর এখানে বহু শহর গড়ে উঠেছে। **সেকেন্ড ক্লাস–** এখনকার নবম শ্রেণি। **সদ্ব্যয় করিয়াছি–** অপব্যয় করেছি বোঝাতে ব্যঙ্গ ভরে বলা হয়েছে। **হুমায়ূন–** মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের পিতা।

তারপর একদিন ছেলেপুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।–

সমাজের সচ্ছল অভিভাবকগণ লেখাপড়ার প্রতি সব সময়ই সজাগ থাকেন। বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও পথ দুর্গম হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করা কষ্টকর। তাছাড়া, দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠাভ্যাস করা সম্ভব হয় না। ফলে, অনিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসের কারণে পড়ালেখার প্রকৃত মান অর্জনে শিক্ষার্থীগণ সাফল্য লাভ করে না। সন্তানের লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহী ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদগ্রীব অভিভাবকগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতেন। শহরের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত অভিভাবক ও সন্তান-সন্ততিগণ পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন না। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও অবকাঠামো সৃষ্টির অভাবে গ্রাম বাংলার এ করুণ চিত্র যেন চিরকালের।

সারসংক্ষেপ

পল্লিগ্রামের বিদ্যার্থীদের শিক্ষায় সাফল্য লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। শতকরা প্রায় আশি জন শিক্ষার্থীকে জীবনে এ দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য একটি গ্রাম থেকে দূরবর্তী অবস্থানের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য শিক্ষার্থীর অধিকাংশ শক্তি ব্যয় করতে হয়। ফলে, বিদ্যাভাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় শ্রমক্লান্ত অবসন্ন শরীর প্রদান করতে পারে না। কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীর নিকট বিদ্যালয়ে যাত্রাপথের দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা নানান ধরনের আকর্ষণের উপকরণ এত বেশি প্রলুব্ধ করে যে, শিক্ষা লাভের জন্য আবশ্যক তথ্যগুলি বড় বেশি অনাবশ্যক বলে মনে হয়।মৃত্যুঞ্জয় লেখকের একই গ্রামের ছেলে। নিরীহ, পরিজনহীন মৃত্যুঞ্জয় গ্রামের প্রান্তে একটি বিশাল পোড়ো বাড়িতে একাকী বসবাস করত। বাড়ি সংলগ্ন প্রকাণ্ড আম কাঁঠালের বাগান থেকে প্রতি বৎসর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা

মৃত্যুঞ্জয়ের ভালোভাবেই চলত। এ বাগানটির প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র দূর সম্পর্কের খুড়া একজন ভাগীদার বলে সকলের নিকট বলে বেড়াত। কিন্তু এ দাবীর প্রতি সত্যনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ না থাকায় মৃত্যুঞ্জয়ের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটেছে বলে শোনা যায়নি।মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাস অর্থাৎ ৮ম শ্রেণির ছাত্র হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু এ ক্লাসের ছাত্র হিসেবে কত দিন ধরে অধ্যয়ন করে আসছে সে ইতিহাস অনেকেরই অজানা। স্বল্পভাষী মৃত্যুঞ্জয় প্রতিদিন জীর্ণ মলিন পুস্তক বগলে করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করত। কারো সংগে সে নিজে থেকে আলাপ না করলেও অনেকেই উপযাচক হয়ে আলাপ করতে উৎসাহী ছিল। কারণ, অন্যকে খাওয়ানো এবং গোপনে অর্থ সাহায্য করতে মৃত্যুঞ্জয়ের কার্পণ্য ছিল না। কিন্তু এহেন পরোপকারী, নিরহংকার মানুষটির প্রতি গ্রামবাসী যে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিল তা নয়।

দীর্ঘদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা না পেয়ে লেখক খোঁজ খবর নিতে গিয়ে লোকমুখে তার অসুস্থতার সংবাদ জানতে পারেন। একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে সন্ধ্যার অন্ধকারে লেখক তাকে দেখতে যান। মরণব্যাধির সংগে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বেঁচে ওঠা, জীর্ণ কংকালসার শরীর দেখে লেখক বুঝতে পারেন, অপরিমেয় সেবা ও যত্নে এ যাত্রায় মৃত্যুঞ্জয় রক্ষা পেয়েছে। দিবারাত্র অনলস সেবা ও অবিরাম রাত্রি জাগরণের ছাপ নিয়ে রোগীর শয্যাপাশে দাঁড়ানো নারীই যে দরিদ্র সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী একথা লেখক বুঝতে পারেন। সেবা, শুশ্রূষা, মমতা ও হৃদয়ের অপরিমিত প্রাণশক্তি নিয়ে পাশে না দাঁড়ালে এমন রোগীকে বাঁচানো দুঃসাধ্য। অসম গোত্রের এক নারী সমাজের সকল ভ্রূকূটি উপেক্ষা করে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার এমন উদাহরণ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অথচ মৃত্যুঞ্জয়ের নিত্য সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো গ্রামবাসী তার রোগশয্যা পার্শ্বে এ সময়ে উঁকি মেরে দেখে নাই। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি পল্লিগ্রামের মানুষের বিপদে আপদে ঔদাসীন্যের পরিচয় লেখক আলোচ্য অংশে অত্যন্ত তির্যক ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বঁইচি কী?

ক. কাঁটাযুক্ত ছোট গাছ
খ. কাঁটাবিহীন ছোট গাছ
গ. কাঁটাযুক্ত বড় গাছ
ঘ. কাঁটাবিহীন বড় গাছ

২. 'সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. প্রত্যাশা
খ. হতাশা
গ. বিষাদ
ঘ. ব্যঙ্গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'শেষ পরিচয়' উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। গল্পের কথক অমূল্য বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র।

৩. উদ্দীপকের অমূল্য'র সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. ন্যাড়া
খ. খুড়া
গ. বিলাসী
ঘ. বিলাসীর বাবা

৪. উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?

i. ছোটগল্পের আঙ্গিকগত দিক
ii. ছোটগল্পের নামকরণ
iii. ছোটগল্পের বিষয়বস্তু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ.iii
ঘ. ii ওiii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথার চিত্রটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সবলের উপরে দুর্বলের অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতে পারবেন।
- সুবিধাভোগীর শ্রেণিচরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অসহায়ক্লিষ্ট মানুষের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের করুণ পরিণতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনের পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভালোবাসার শক্তি যে সকল প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন থেকে প্রাপ্ত ঘটনার আলোকে তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজে প্রচলিত অমানবিক আচরণের চিত্র অংকন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না– অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ে মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই তো হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে– ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা– অ্যাঁ এ হইল কী? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল।

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুন সবাই। কিন্তু আর তো চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির-বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের ওপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়ো ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোনো খুড়া কোনো কালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়াছে জানো?

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সঙ্গে দশ-বারোজন বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না। কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কী কথা! সনাতন হিন্দু এ

কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে– রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।"

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা থাক।

আপনারা মনে করিবেন না; পল্লিগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড় লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত তাহা হইলে তো আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা– এতো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী। কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়। ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে তো আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে পল্লিগাঁয়ের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে, তারাই তো একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া।

এই তো ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রামের বারোয়ারি পূজাবাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা-উত্তর ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কী, পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণে নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লিবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এ দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লিতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মতো অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেরই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুর বেলা ক্রোশ-দুই দূরের মালোপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা– কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যে জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গিয়াছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ-পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রাস পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভালো কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে– তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে

কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই তো মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লিগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক। ঝোঁকের মাথায়, হয়ত বা অনধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে যে, আমি কোনোমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বইজন নরনারীই ঐ পল্লিগ্রামেরই মানুষ এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, "তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্য না জানি কত মার তুমি খেয়েছিলে।"

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা ওখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের ওপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখ্‌রো সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কী জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে–

–ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন–

মনসা দেবী আমার মা–

ওলটপালট পাতাল-ফোঁড়–

ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে–

–দুধরাজ, মণিরাজ।

কার আজ্ঞা– বিষহরির আজ্ঞা।

ইহার মানে যে কী তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন– নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন– তাঁর সাক্ষাৎ কখনও পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি যো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে তো ভাল মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো। বস্তুত বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপধরাও কঠিন নয় এবং ধরাসাপ দুই চারিদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপর তাহাকে শিকড়ই দেখান

হোক বা একটা কাঠিই দেখান হোক, সে কোথায় পালাইবে তা ভাবিয়া পায় না। এ কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করে মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে– এতে দোষ কী?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের তো খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাইতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বার বার লক্ষ করিয়াছি। সাপ ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত– আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কী। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার তো এক রকম নেশার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুত ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এ পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মঝে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে– সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় এক-জোড়া তো আছে বটেই, হয়ত বা বেশি থাকিতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখছ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে।

বিলাসী কহিল দু-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিস গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্‌টা পিঠ দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পালাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি তো ছিলই, তাহার উপরেও আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার ঊর্ধ্বে আর উঠিবে না, বরং সেই "বিষহরির আজ্ঞা" মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম বিষহরির দোহাই বুঝি বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনও বা একসঙ্গে কখনও বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন ওঝা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম তাহার শ্বশুরের দেয়া মন্ত্রৌষধি সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনিটি আর বাড়াইব না। কেবল এটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।

আমার মাদুলি-কবচ তো মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নহে এবং সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে তো আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখনই যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোলআনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, তো হবে কার? পুরুষ মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে তো তেমন আসে যায় না– না হয় একটু নিন্দাই হত। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কী! অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায় ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তো পল্লিগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই তো মানুষ। তবু অত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনোটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক document তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া Contract পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী-অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্র হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহাদের হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নহে, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এ বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের ওপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এ হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মতো দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মতো বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মতো পাপ হয় না।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অকালকুষ্মাণ্ড– অপদার্থ। **এন্ট্রান্স**– এস.এস.সি পাশের সমতুল্য। **কালি–** আধুনিক কাল অর্থে। **তিলার্ধ**– বিন্দুমাত্র, সামান্যমাত্র। **দক্ষিণা**– ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর পর প্রদত্ত অর্থ। **পিণ্ডি**– শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গ করা গোলাকার চালের ডেলা। **প্রায়শ্চিত্ত**– চিত্তের বিশুদ্ধতা সাধন। **ফলাহার–** ফল-ভোজন, নিরামিষ দ্রব্য দ্বারা ভোজন বা আহার। **বদনদগ্ধ**– লজ্জায় মুখ দেখাতে না পারা অর্থে। **বারওয়ারী–** সমবেতভাবে যে অনুষ্ঠান বা উৎসব করা হয়।**সম্ভাষণ**– সম্বোধন। **ম্লেচ্ছদেশে**– অনার্য, অস্পৃশ্যদের দেশ। **মনসা**– সাপের দেবী। **সাগরেদ**– শিষ্য।

সারসংক্ষেপ

মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়ের সংবাদ এবং বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়ার অপরাধে খুড়া সকল গ্রামবাসীকে জড়ো করে এরূপ সামাজিক অনাচার ও গর্হিত কাজের জন্য বিচার জানায়। গ্রামের অনেকে সোৎসাহে বিলাসীকে নির্দয় প্রহার

করে।মৃত্যুঞ্জয়ের অপরাধ অমার্জনীয়, সে অন্নপাপী। দীর্ঘদিন ন্যাড়ারূপী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীদের সংগে কোনো প্রকার যোগাযোগ ছিল না। শরৎচন্দ্র সন্ন্যাস জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিজগ্রামে চলে আসেন। মৃত্যুঞ্জয় লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বিলাসীর সংগে দাম্পত্য জীবন যাপন করছে। নিজ জাত-ধর্ম ত্যাগ করে বিলাসীর পিতৃপেশা গ্রহণ করে মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে হিসেবে এখন পরিচিত। সাপ ধরাই এখন তার একমাত্র পেশা। ন্যাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মহা উৎসাহে সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত। বিলাসী ন্যাড়া ও মৃত্যুঞ্জয়কে এ পেশা ত্যাগ করার জন্য বহুভাবে অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়। অবশেষে একদিন সাপ ধরতে গিয়েই মৃত্যুঞ্জয় মারা যায়। ওঝা, বৈদ্যের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে।বিলাসী জীবনের সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার বিনিময়ে যে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছিল- তার পক্ষে মৃত্যুঞ্জয়বিহীন জীবনযাপন করা আর সম্ভব ছিল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিলাসী বিষপানে আত্মহত্যা করে। ছোটজাত, নিম্নবর্ণের বিলাসীর মহৎপ্রেমের এ একনিষ্ঠতার প্রকাশ পাঠক মনকেও ভারাক্রান্ত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. ন্যাড়ার সন্ন্যাসগিরিতে ইস্তফা দেয়ার কারণ কী?

ক. বাঘের ভয় খ. সাপের ভয়
গ. মশার কামড় ঘ. সাধনায় কষ্ট

৬. 'কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়'– 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের এই পরিবর্তন কোথায় ঘটেছে?

ক. অন্নপাপে খ. জাতবিসর্জনে
গ. স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় ঘ. সম্পদ হারানোয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা মনীষা নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে আশিককে পরিবারের অমতে বিয়ে করে। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আজ সে আটপৌরে জীবনযাপন করছে।

৭. উদ্দীপকের মনীষা 'বিলাসী' গল্পে কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. মৃত্যুঞ্জয় খ. বিলাসী
গ. ন্যাড়া ঘ. পুত্রবধূ

৮. উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?

i. শ্রেণিবৈষম্য
ii. কুসংস্কার
iii. মূল্যবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ.ii
গ. iii ঘ. ii ওiii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. বিলাসী কার মেয়ে?

ক. পুরোহিত খ. সাপুড়ে
গ. কৃষক ঘ. পুলিশ

১০. 'গেল গেল গ্রামটা রসাতলে গেল' –কেন?

ক. মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর বিবাহে খ. ন্যাড়া বিলাসীকে সহমর্মিতা দেখানোয়
গ. মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কেটেছে ঘ. বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে ভাত খাওয়ানোয়।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

'অচলায়তন' নাটকে অচলায়তন বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা দাদাঠাকুর। এর শিক্ষার্থীরা প্রথা, বিধান ও সংস্কারের দাস। পাশের গ্রামে নীচু জাতের লোকেরা বাস করে। দাদাঠাকুর এদের সঙ্গে মেশার জন্য আর বিদ্যামন্দিরে অবস্থান করেন না।

১১. উদ্দীপকের দাদাঠাকুরের সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পে কোন চরিত্রটির মিল রয়েছে?

ক. বিলাসী　　খ. মৃত্যুঞ্জয়
গ. ন্যাড়া　　ঘ. খুড়া

১২. উদ্দীপকে 'বিলাসী' গল্পের কোন সামাজিক দিকটি ফুটে উঠেছে?

i. বর্ণপ্রথা
ii. অজ্ঞতা
iii. শ্রেণিবৈষম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

গৌরাঙ্গ রায় উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী হলেও সমাজের প্রচলিত সংস্কারকে উপেক্ষা করার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা তার ছিল না। কিছুদিন পূর্বে তার গ্রামের গোঁড়া হিন্দুরা এক কিশোরী মেয়েকে মৃতপ্রায় কুলীন বরের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেয়। গৌরাঙ্গ রায় কাজটিকে মন থেকে সমর্থন না করলেও সেদিন তিনি গোঁড়াদের সঙ্গেই ছিলেন।

ক. সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসায় কোনটি?
খ. 'গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম' –বুঝিয়ে লিখুন।
গ. উদ্দীপকের গৌরাঙ্গের সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়ার কীভাবে সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের সহজাত বিকাশের অন্তরায়।" –উদ্দীপক ও 'বিলাসী' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

আমাদের দেশে সনাতন সমাজে বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যাটা বেশ প্রকট। এই জাতপাতের সমস্যার কারণে বহু ছেলেমেয়ের জীবন অকালে ঝরে যায়। রক্ষণশীল সমাজ উঁচু ও নিচুকুলের বিবাহ সহজে মেনে নিতে পাওে না। তারা নানা উপায়ে বিবাহের পাত্র-পাত্রীকে গ্রামছাড়া করতেও দ্বিধা কওে না।

ক. মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানটি কত বিঘার ছিল?
খ. 'চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি।' –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের কোন বিষয়টি 'বিলাসী' গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'বিলাসী' গল্পের সমাজ-বাস্তবতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসায় হচ্ছে শিকড় বিক্রি করা।

খ.

গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের নেতিবাচক ভাবমূর্তিকে ব্যঙ্গ করে 'সুনাম' বলা হয়েছে।

'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের এক জ্ঞাতি খুড়া ছিল। এই খুড়া তার নামে গাঁজা খাওয়া, গুলি খাওয়াসহ নানাপ্রকার অপবাদ দিয়ে বেড়াত। এ দুর্নাম প্রচারের কল্যাণে গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। ফলে গ্রামবাসী তার সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা দূরে থাক এমনকি তার সঙ্গে সংশ্রব রাখার কথাটা পর্যন্ত অস্বীকার করত। বস্তুত উক্তিটিতে মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে 'সুনাম' শব্দটি গল্পকথক ন্যাড়া 'দুর্নাম' অর্থে ব্যবহার করেছে।

গ.

মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের গৌরাঙ্গ রায় এবং 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
বাংলার হিন্দু সমাজ চিরকালীন বা সনাতন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সমাজব্যবস্থা আচারসর্বস্ব ও সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন। কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা কখনো কখনো এ সমাজের মানবিক চেতনাকে সংকুচিত করে রাখে। এছাড়া জাতিগত বিভেদের ফলে সমাজে অনেক সময় দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে না।
উদ্দীপকে গৌরাঙ্গ রায় উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী। কিন্তু সমাজের প্রচলিত রীতিকে উপেক্ষা করে একটি কিশোরী মেয়েকে রক্ষা করার মত দৃঢ়তা তার মধ্যে নেই। অন্যদিকে 'বিলাসী' গল্পে দেখা যায়, গল্পকথক ন্যাড়ার মানসিকতাও উদার কিন্তু সে বিলাসীকে গ্রামের মানুষের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি তার দৃঢ়চিত্ত মানসিকতার অভাবে। উদ্দীপকের গৌরাঙ্গ রায় ও 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া কারোর মনই সংকীর্ণ কিংবা গোঁড়া নয় কিন্তু যথেষ্ট সাহসের অভাবে তারা কেউই সমাজের অন্যায়কে রুখে দিতে পারেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের গৌরাঙ্গ রায় ও 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া চরিত্র দুটো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ.
ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের সহজাত বিকাশের অন্তরায়। আর এই অনাচারের শিকার হয় সাধারণ মানুষ।
প্রাচীনকাল থেকে সনাতন সমাজের আচার-রীতিগুলো মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। এই রীতির অনেকগুলো মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায়। অবশ্য অনেকগুলো সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। তবুও যা রয়ে গেছে তার কারণেই আজও সাধারণ মানুষ অনেকক্ষেত্রেই নিগ্রহের শিকার হচ্ছে।
উদ্দীপকে ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা বলা হয়েছে। এর শিকার হয়েছে এক কিশোরী নারী। তাকে মৃতপ্রায় এক কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে 'বিলাসী' গল্পে সমকালীন আচারসর্বস্ব হিন্দুসমাজের অনেক অনাচার স্থান পেয়েছে। এই অনাচারের শিকার হয়েছে মূলত মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসী। 'বিলাসী' গল্পে পুরুষরা বিলাসীর মত নিরীহ নারীকেও বেদম প্রহার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। আবার মৃত্যুঞ্জয়কে সমাজচ্যুত করা হয় অন্নপাপের অপরাধে। ফলে করুণ মৃত্যু হয় মৃত্যুঞ্জয়ের আর আত্মহনন করে বিলাসী।
উদ্দীপকে ধর্মীয় বাতাবরণে হরণ করা হয়েছে একটি কিশোরীর জীবন। 'বিলাসী' গল্পেও দেখা যায় ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কার নিঃশেষ করেছে বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়কে, আর তাদের স্বপ্নকে। উদ্দীপক এবং 'বিলাসী' গল্পের চরিত্রগুলো আমাদের সমাজের নিতান্তই সাধারণ মানুষ, আর তারাই ধর্মীয় গোঁড়ামির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাই বলা যায়, ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে অস্বীকার করে আর ধ্বংস করে তাদের স্বপ্নকে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

আমি নারী। আমি হৃদয় দিয়ে বিশ্ব জয় করবো। ইব্রাহিম কার্দিকে মুক্ত করবো। তাকে এই হৃদয়ের রক্ততলে বন্দী করবো। আপনি কেন আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে চেষ্টা করছেন?

ক. কামস্কাট্‌কা কোথায় অবস্থিত?
খ. 'আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।' –কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. বিলাসী চরিত্রে প্রেমের যে গভীরতা ফুটে উঠেছে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।
ঘ. 'হৃদয়ের অপরিমেয় ভালবাসাই জগতের অশুভ ও অকল্যাণকে দূর করতে পারে।'–উদ্দীপক ও 'বিলাসী' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. খ ৭. খ ৮. ক ৯. খ ১০. ক ১১. খ ১২. ঘ